"অর্থ পাচার এবং আমাদের রাজনৈতিক অর্থনীতি"

১. প্রেক্ষাপট:

বাংলাদেশের বর্তমান রাজনীতি এবং অর্থনীতি উভয় প্রেক্ষাপটেই অর্থ পাচার বিষয়টি এখন অন্যতম প্রধান আলোচিত ঘটনা। প্রতি বছরই দেশ থেকে প্রচুর পরিমান অর্থ বিদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে অবৈধ আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে। গ্লোবাল ফাইনানসিয়াল ইনটিগ্রিটি প্রতিবেদন-২০১৫ এর তথ্য অনুযায়ী ২০০৪-২০১৩ এই দশ বছরে অবৈধ অর্থ পাচরের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থান হচ্ছে ২৬ তম এবং প্রতি বছর গড়ে প্রায় ৬ বিলিয়ন ডলার এদেশ থেকে পাচার হয়ে যাচ্ছে। **শুধুমাত্র ২০১৩ সালে এর পরিমান সর্বচ্চো যা ৭৭,৬০০ কোটি টাকা (৯.৭ বিলিয়ন ডলার), যা ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বৈদেশিক অনুদানের ১২গুনেরও বেশি এবং বৈদেশিক ঋণের ১৪১% বেশি।**

অর্থ পাচারের এই চিত্র ইতিমধ্যে দেশের অর্থনীতিবিদ ও পরিকল্পনাবিদদের শংকিত করে তুলেছে, বিশেষ করে পাচারের এই আশংকাজনক উর্ধ্বগতির কারনে দেশে পরিকল্পিত ও কাংখিত বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থানের সংকট দেখা দিচ্ছে বলে অর্থনীতিবিদগন মনে করছেন। পাশাপশি সরকারও তার নিজস্ব উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় সম্পদ ঘাটতী মোকাবেলা করতে হচ্ছে। এই ঘাটতী মোকাবেলার ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করছি যে, সরকার ব্যাংক ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীলতা এবং ভ্যাট এর মত পরোক্ষ করের বোঝা দরিদ্র জনগনের উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। অর্থ পাচার রোধে সরকার যদিও এক্ষেত্রে কিছু নীতিমালা করছে কিন্ত এর সুষ্ঠ ও কার্যকর বাস্তবায়নের অভাবে দেশ থেকে অর্থ পাচার রোধ বা এর পরিমান হ্রাস করা সম্ভব হচ্ছে না।

উপরোক্ত পরিস্থিতি বিবেচনায় দেশের অর্থনীতবিদি, পরিকল্পনাবিদ এবং নাগরিক সমাজ সহ সকলেই এটা মনে করছেন যে, রাজনৈতিক অঙ্গীকার ছাড়া কোন অবস্থাতেই দেশ থেকে অর্থ পাচার রোধ বা হ্রাস করা সম্ভব হবে না। সুতরাং ভবিষত্যে দারিদ্র দূরীকরন, বৈশ্বিক টেকসই লক্ষসমুহ অর্জন এবং সরকারের ঘোষিত "ভিশন-২০২১" যদি সত্যিকার অর্থেই অর্জন করা সরকারের একটি লক্ষ্য হয়ে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে অর্থ পাচার রোধে সরকারের এবং সকল রাজনৈতিক দলের ন্যুনতম রাজনৈতিক অঙ্গীকার এবং তা বাস্তবায়নের একটি রূপরেখার প্রয়োজন রয়েছে বলে আমরা সকলেই মনে করি।

২. কর স্বর্গরাজ্য নামে পরিচিত দেশসমূহে অর্থ পাচার বেড়ে যাচ্ছে:

যুক্তরাজ্য ভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'ট্যাক্স জাস্টিস নেটওয়ার্ক' গত ২ নভেম্বর, ২০১৫ Financial Secrecy Index (FSI)-2015 নামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে উন্নয়নশীল দেশসমূহ কিভাবে বিভিন্ন দেশ হতে অবৈধ অর্থ প্রবাহের মাধ্যমে নিজ দেশে বা তাদের আঞ্চলিক দেশসমূহে অর্থ স্থানান্তর করে ঐ সকল দেশসমূহের সামগ্রিক অর্থনীতিকে দূর্বল এবং ঋণগ্রস্ত করে তুলে, তার একটি চিত্র তুলে ধরা।

প্রতিবেদনে বলা হয়, আর্থিক গোপনীয়তা রক্ষায় শীর্ষ ১০টি দেশ হচ্ছে সুইজারল্যান্ড, হংকং, যুক্তরাষ্ট্র, সিঙ্গাপুর, কেম্যান আইল্যান্ড (যুক্তরাজ্য), লুক্সেমবার্গ, লেবানন, জার্মানী, বাহরাইন এবং দুবাই। প্রতিবেদনে সুইজারল্যান্ড-কে কর স্বর্গের "**গডফদার**" বলে মন্তব্য করা হয়েছে, কারন এ দেশে অর্থ যেমন বেশী পাঠানো হয়, তেমনি থাকে সুরক্ষিতও। এসকল দেশ উন্নয়নশীল দেশগুলোকে বৈদেশিক অনুদানের নামে বছরে ১৩৫বিলিয়ন ডলার প্রদান করলেও ১-১.৬ ট্রিলিয়ন ডলারেরও বেশি অর্থ অবৈধ ভাবে নিয়ে যাচ্ছে। **অর্থাৎ তারা প্রতি ১ ডলার অনুদানের বিপরীতে ১০ডলার আদায় করে নিচ্ছে অনৈতিক অর্থ প্রবাহের মাধ্যমে।** এশিয়ায় সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন ও শ্রীলংকা করস্বর্গরাজের দিকে যাচ্ছে।

উন্নত বিশ্বের রাজধানীতে অবস্থিত বিশ্বের বড় বড় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান গুলো এ ধরনের অর্থ পাচারে উৎসাহিত করে থাকে। এভাবে বিভিন্ন দেশের ধনীরা কর ফাঁকি দিচ্ছে আর গরীব মানুষরা সেই ঋণের বোঝা টানছে। এর ফলে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশ গুলো বিপুল রাজস্ব আয় থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, যা

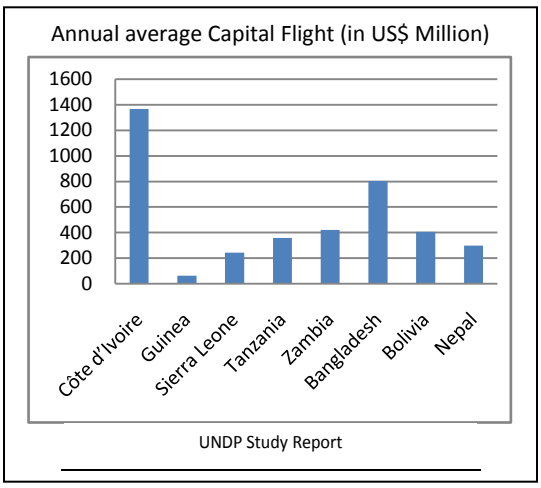

দেশগুলোর অর্থনীতিকে দূর্বল এবং ঋণগ্রস্ত করে তুলছে।

১৯৭০ সালের পর থেকে শুধুমাত্র আফ্রিকা থেকে ১ ট্রিলিয়ন ডলারেরও বেশি অর্থ পাচার হয়েছে এবং এর বিপরীতে অঞ্চলটির মোট ঋণের পরিমাণ ২০০ বিলিয়ন ডলার, যা ঐ পাচারকৃত অর্থের কাছে খুবই নগন্ন। ঠিক একইভাবে বাংলাদেশ থেকেও অবৈধ অর্থ প্রবাহের মাধ্যমে কর স্বর্গরাজ্য দেশসমূহে অর্থ পাচার হয়ে যাচ্ছে।

৩. বাংলাদেশ প্রেক্ষিত:

ক) হুন্ডি ও ট্রান্সফার প্রাইজিং-এর মাধ্যমে টাকা পাচার:

বাংলাদেশ থেকে আমদানি-রপ্তানির সময়ে পণ্যের প্রকৃত মূল্য গোপন করা, রেমিটেন্স ও হুন্ডির মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি অর্থ পাচার করা হয়ে থাকে। GFI এর অনুযায়ী ২০০৪ থেকে ২০১৩ বছরে এভাবে পাচার করা অথের্র পরিমাণ প্রায় ৪ হাজার ৯১৩ কোটি ২০ লাখ ডলার। এর মধ্যে ২০১৩ সালেই পাচার হয় ৮৩৫ কোটি ৫০ লাখ ডলার। বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজস্ব বোর্ডসহ বিভিন্ন সূত্র অনুযায়ী বছরে প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকা হুন্ডির মাধ্যমে, ১০ থেকে ১৬ হাজার কোটি টাকা মূল্য অবমূল্যায়ন এবং অন্যান্য অবৈধ উপায়ে আরো প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকা বাংলাদেশ থেকে পাচার হচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতি অনুযায়ী বিদেশে ৫,০০০ ডলারের বেশি অর্থ পাঠানো যায়না, তাহলে এত টাকা পাচার হলো কী করে? *[আমাদের বুধবার: ২৫/০৩/২০১৫]*

খ) Global Financial Integrity (GFI) এর বিশ্লেষন:

GFI এর সর্বশেষ রিপোর্ট অনুযায়ী ২০০৪ থেকে ২০১৩ অর্থাৎ এক দশকে বাংলাদেশ থেকে বিদেশে পাচার হয়েছে ৫,৫৮৭.৭০ কোটি ডলার। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি পাচার হয়েছে ২০১৩ সালে, যার পরিমাণ ৯৬৬ কাটি ৬০ লাখ ডলার বা প্রায় ৭৫ হাজার কোটি টাকা, **যা ওই বছরের মোট জিডিপি'র প্রায় ৭% এবং ওই বছর পাওয়া মোট বৈদেশিক অনুদানের ১১গুনের বেশি এবং বৈদেশিক ঋণের ৫ গুনেরও বেশি**।

GFI Report-2015 (IFF from BD), Tk Billion

Year	Illicit Financial Flow	Trade Misinvoicing	Illicit Hot Money outflow
2004	261.07	261.07	0.00
2005	332.44	272.53	59.90
2006	263.48	213.25	50.15
2007	319.64	260.68	58.97
2008	502.55	477.83	24.73
2009	477.91	423.54	54.37
2010	421.90	390.62	31.36
2011	461.84	370.50	91.34
2012	563.55	510.59	52.96
2013	753.95	651.69	102.26
Total	**4358.33**	**3832.30**	**526.03**
Average	**435.83**	**383.23**	**52.60**

এর আগের বছর পাচার হয় ৭২২ কোটি ৫০ লাখ ডলার। এ হিসাবে এক বছরের ব্যবধানে অবৈধ অর্থ প্রবাহ বেড়েছে ৩৩ শতাংশ। এছাড়া ২০০৮ ও ২০০৯ সালেও অবৈধভাবে পাচার হয় যথাক্রমে ৬৪৪ কোটি ৩০ লাখ ও ৬১২ কোটি ৭০ লাখ ডলার। ২০০৯ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর গড়ে অর্থ পাচার বৃদ্ধির হার হিসাব করলে ২০১৪ সালে অর্থ পাচারের সম্ভাব্য পরিমাণ দাড়াতে পারে ১৪.০৫ বিলিয়ন ডলারে। এ হিসাবে ২০০৯-২০১৪ সময়কালে বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে পাচারের সম্ভাব্য পরিমাণ দাড়াতে পারে ৪৮.৩৬বিলিয়ন ডলার বা ৩,৭৭,২৩৮ কোটি টাকা, যা ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের বাংলাদেশের জাতীয় বাজেটের তুলনায় প্রায় ২৮% বেশি। **এ পরিমাণ অর্থ দিয়ে সরকার কমপক্ষে ৮২ হাজার কোটি টাকা অতিরিক্ত রাজস্ব সংগ্রহ করতে পারতো। আর এ অর্থ দিয়ে ২/৩ টি পদ্মা সেতু বানানো সম্ভব হতো, বিদেশ থেকে অধিক সুদে ঋণ গ্রহণের প্রয়োজন পড়তো না**।
[আমাদের বুধবার: ১৬/১২/২০১৫]

গ) রাষ্ট্রায়াত্ব এবং বেসরকারি ব্যাংক থেকে আত্মসাৎ:

২০১১ সাল থেকেই শেয়ার বাজার, সোনালী ও বেসিক ব্যাংকসহ বিভিন্ন রাষ্ট্রায়াত্ব এবং বেসরকারি ব্যাংক থেকে প্রভাবশালীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তায় হলমার্ক, বিসমিল্লাহ গ্রুপসহ বিভিন্ন কোম্পানির হাজার হাজার কোটি টাকা আত্মসাতের ঘটনা ঘটেছে। এনবিআর এর তথ্য মতে, শুধু সরকারি ব্যাংক (সোনালী, জনতা, রুপালী, অগ্রনী ও বেসিক ব্যাংক) হতে প্রায় ২০,০০০কোটি টাকা লুটপাটের অভিযোগ রয়েছে। এর মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত সোনালী ব্যাংকের বিভিন্ন শাখা থেকেই প্রায় ১০,০০০কোটি টাকা লোপাটের ঘটনা ঘটেছে। ২০১০ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে ব্যাংকটির শুধু একটি শাখা থেকে অবৈধভাবে ঋণ দেয়া হয়েছে প্রায় ৩,৫৪১ কোটি টাকা (৪৫.৪০ কোটি ডলার)। ২০০৯ থেকে ২০১২ সালে রাষ্ট্রায়ত্ত আরেক ব্যাংক বেসিক ব্যাংক থেকে লুট হয়েছে প্রায় সাড়ে ৪,৩৬৮ কোটি টাকা (৫৬ কোটি ডলার)। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর দায়িত্বহীনভাবে ঋণদানের প্রবণতা ও খেলাপি ঋণগ্রহীতাদের পার পেয়ে যাওয়ার বড় কারণ হলো বাংলাদেশের ব্যবসায়ী ও রাজনৈতিক এলিটদের পারস্পরিক আঁতাত। কারন, টেকনোক্র্যাট বা অডিটর কারোরই এটা ঠেকানোর মতো যথেষ্ট ক্ষমতা বা শক্তি নেই। ২০০৮ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত রাষ্ট্রায়ত্ত একটি ব্যাংকের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী এক গবেষক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন, ব্যবসায়িক সম্ভাবনা বিবেচনায় নয়, বরং প্রভাব বা উচ্চপর্যায়ে যোগাযোগের ভিত্তিতে ঋণদানের প্রবণতা বেড়েছে। এসব ঋণই মূলত খেলাপি হয়ে যাচ্ছে। *[আমাদের বুধবার: ২৫/০৩/২০১৫, ১৯/০৮/২০১৫, বনিক বার্তা ১২/০৪/২০১৬]*

ঘ) বাংলাদেশ ব্যাংক রিজার্ভ অর্থ চুরি ও কর্মকর্তাদের সম্পৃক্ততা:

গত ৫ ফেব্রুয়ারি সুইফট কোডের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল ব্যাংকে মজুদ বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ থেকে মোট ১০.১০ কোটি ডলার শ্রীলঙ্কা ও ফিলিপাইনে পাচার করা হয়। অর্থ পাচারের পরপরই বাংলাদেশ ব্যাংককে শ্রীলঙ্কার কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঘটনা জানায় এবং পাচার হওয়া অর্থ ফেরত দেয়। কিন্তু ফিলিপাইনে পাচার হওয়া ৮.১০ কোটি ডলার (৬৩২ কোটি টাকা) লুটেরা নিয়ে যেতে পেরেছে। **তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার হলো ৫ ফেব্রুয়ারির এ ঘটনা বাংলাদেশ ব্যাংক এক মাসেরও বেশি সময় ধামাচাপা দিয়ে রাখে**। এমনকি গত ২৯ ফেব্রুয়ারি ফিলিপাইনের সংবাদপত্র 'দি ফিলিপিন্স ডেইলি ইনকোয়ারার' অর্থ পাচারের প্রতিবেদন ছাপলেও ৭ মার্চ বাংলাদেশ ব্যাংক লিখিত এক বিবৃতির মাধ্যমে দেশে-বিদেশে আলোচিত এ ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে। প্রশ্ন হলো- এতবড় ঘটনা বাংলাদেশ ব্যাংক কেন এতদিন চেপে রেখেছিল এবং এক মাসেরও বেশি সময় খোদ অর্থমন্ত্রীকেও তারা ঘটনা অবহিত করেনি কেন? **মাননীয় অর্থমন্ত্রী এক সাক্ষাৎকারে [প্রথম আলো: ১৮/০৩/২০১৫] বলেন রিজার্ভ থেকে অর্থ চুরির ঘটনায় বাংলাদেশ ব্যাংকের বর্মকর্তারা জড়িত, কারন ছয়জন লোকের হাতের ছাপ ও বায়োমেট্রিক্স ফেডারেল রিজার্ভে আছে। নিয়ম হলো, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এভাবে ষষ্ঠ ব্যক্তি পর্যন্ত নির্দিষ্ট প্লেটে হাত রাখার পর লেনদেনের আদেশ কার্যকর হয়**।

অপ্রদর্শিত অর্থের উৎস:

অবৈধ বা অনৈতিক কর্মকান্ড	বৈধ কিন্তু জাতীয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত নয়
ঘুষ, দুর্নীতি, চোরাচালান, অবৈধ অস্ত্রের ব্যবসা, সম্পত্তি দখল, রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের লোকসান, বেসরকারীকরণ, শিল্প স্থাপনের জন্য নেওয়া ঋণের অর্থ লুট, নগদ সহায়তা ও কর অবকাশ সুবিধার নামে বিভিন্ন সরকারী সুযোগ সুবিধা থেকে অর্থ আত্মসাৎ, আন্তর্জাতিক টেন্ডার চুক্তি, সরকারী ক্রয়, বৈদেশিক মুদ্রার অবৈধ লেনদেন, মুদ্রা পাচার ও হুন্ডি, মাস্তানি/ চাঁদাবাজী/ সন্ত্রাসী কার্যকলাপ, সিনেমা তৈরি ও হাউজিং ব্যবসা, চোরাকারবার, সুবিধা আদায়ের লক্ষ্যে আইনের অপব্যবহার, কালোবাজারী, ভেজাল পণ্য উৎপাদন ও বিক্রি ইত্যাদি।	বিনিয়োগে অস্বাভাবিক মুনাফা, পেশাজীবীদের অতিরিক্ত ফি, পুঁজির অতিরিক্ত আয়, অতিরিক্ত ব্যক্তি আয় ইত্যাদি।

ঙ) অপ্রদর্শিত অর্থের রাজনৈতিক অর্থনীতি:

বাংলাদেশে রাজস্ব আদায় ব্যবস্থাপনার অন্যতম দুর্বল ভিত্তি হচ্ছে অপ্রদর্শিত অর্থনৈতিক কার্যকলাপ বা Underground Economy। বাংলাদেশ ব্যাংক এবং বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ পরিচালিত পৃথক গবেষণায় বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতির পরিমাণ মোট জিডিপি'র ৪৮% হতে ৮৪% পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়েছে। মাননীয় অর্থমন্ত্রী ২০১০-১১ বাজেট পরবর্তী এক প্রেস ব্রিফিং-এ বলেন, বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে অপ্রদর্শিত অর্থনীতির পরিমান জিডিপি'র সর্বোচ্চ ৮৪% এবং সর্বনিম্ন ৪৮%। এর গড় হার বিবেচনা করলে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ছায়া অর্থনীতির পরিমাণ ছিল ৯,৯৯০ বিলিয়ন টাকা। বাংলাদেশে অর্থনীতিবিদগণ অপ্রদর্শিত অর্থনীতির অর্জনের নিম্নোক্ত উৎসের কথা বলেন।

ঘ) মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে অর্থায়ন সংক্রান্ত Asia Pacific Group on Money Laundering এর মূল্যায়ন:

গত অক্টোবর ২০১৫ মাসে Asia Pacific Group on Money Laundering (APG) বাংলাদেশে মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে অর্থায়ন বন্ধকরনে সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ মূল্যায়নের জন্য আসে এবং তারা "Risky" হিসেবে এর মূল্যায়ন করেন । APG উল্লেখ করেন যে এ দুটি বিষয়ে Bangladesh Financial Intelligence Unit (BFIU) বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সহিত সন্তোষজনক কোন কার্যক্রম গ্রহন করেননি এবং সরকারের কাছ থেকে এ বিষয়ে কোন পরিষ্কার ধারনা পয়নি। তারা মনে করে যে বাংলাদেশের বিভিন্ন সংস্থা যেমন দুদক, বাংলাদেশ ব্যাংক, এনবিআর ও বিভিন্ন আইন প্রনয়ন সংস্থার মধ্যে সথেষ্ট সম্বয়হীনতা রয়েছে।

৪. বিদেশের 'সেকেন্ড হোম': মুদ্রা পাচার বন্ধ হবে কি?

ক) মালয়েশিয়ায় ২০০২ সালে "মাই সেকেন্ড হোম প্রোগ্রাম" (এমএমটুএইচ) চালুর পর থেকে **জুন ২০১৩ জুন পর্যন্ত ২৩৭০ জন বাংলাদেশী "সেকেন্ড হোম" সুবিধা নিয়েছে এবং গত এক দশকে "সেকেন্ড হোম" পেকেজ বাবদ ৬,০০০ কোটি টাকা এবং সরাসরি প্লট বা ফ্ল্যাট কেনা বাবদ ৪,০০০ কোটি টাকা পাচার হয়েছে**। এসব অর্থ পণ্যের আমদানি-রফতানি, রেমিটেন্স ও হুন্ডির মাধ্যমে সে দেশে পাচার হয়েছে। *[আমাদের বুধবার: ২৮/১০/২০১৪]*

খ) কানাডার একটি স্থান 'বেগম নগর' হিসেবে পরিচিত পেয়েছে এবং কানাডায় ১.১০কোটি টাকা দিলেই পাওয়া যায় নাগরিকত্ব। সেখানে অনেক ধনী এ নাগরিকত্ব কিনে তাদের বেগম, ছেলেমেয়ে ও বাড়ি-সম্পত্তিসহ সেখানে রেখে দিয়েছেন। **বাংলাদেশ হতে ১৯৭৬ থেকে ২০১০ পর্যন্ত ঐ দেশে অর্থ পাচার হয়েছে প্রায় ২লক্ষ কোটি টাকা, যা ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বাজেটের চেয়ে ৬% বেশি**। *[প্রথম আলো: ২৬/০৫/২০১৩]*

গ) গত চার বছরে নিউইয়র্ক সিটির জ্যামাইকা ও ফরেস্ট হিলস এলাকায় প্রায় **২ মিলিয়ন ডলার নগদ পরিশোধে তিনটি বাড়ির মালিক হয়েছেন বাংলাদেশের জাতিসংঘে বাংলাদেশ মিশনের একজন ইকনোমিক মিনিস্টারের স্ত্রী।** মাত্র তিন বছরের (২০১২-২০১৫) ব্যবধানে ঐ ইকনোমিক মিনিস্টারের স্ত্রী প্রায় তিন মিলিয়ন ডলারের রিয়েল এস্টেট সম্পদের মালিক হন। *[বিডি-প্রতিদিন: ১১/০২/২০১৬]*

৫. সুইস ব্যাংকে টাকা পাচার:

সুইজারল্যান্ডের কেন্দ্রীয় ব্যাংক (এসএনবি) কর্তৃক প্রকাশিত 'ব্যাংকস ইন সুইজারল্যান্ড ২০১৪' শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয়, **২০১৩ সালের তুলনায় ২০১৪ সালে সুইস ব্যাংকে বাংলাদেশি নাগরিকদের ৪০.৭২% অর্থাৎ ১,৩১৮ কোটি টাকা অর্থ বেশি জমা হয়েছে**। বিশ্লেষকরা বলেন, কয়েক বছর ধরেই দেখা যাচ্ছে, মোট জিডিপি'র তুলনায় বিনিয়োগের যে হার রয়েছে, তার চেয়ে সঞ্চয়ের হার বেশি। অর্থনীতিবিদ ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বলেন, **"দেশে বিনিয়োগের তুলনায় সঞ্চয়ের হার ২-৩ শতাংশ বেশি"। সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের বিশেষ ফেলো ড:দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য্যের প্রশ্ন, "অর্থ পাচার করে কারা? শক্তিশালী লোকেরা। দেখার বিষয়, সরকার তাঁদের মুখোশ উন্মোচন করতে চায় কি না**।

বিভিন্ন সময়ে সুইস ব্যাংকগুলোয় বাংলাদেশীদের গচ্ছিত টাকা

সাল	গচ্ছিত সুইস ফ্রাঁ হিসেবে	গচ্ছিত টাকা হিসেবে
২০১৪	৫০.৬০ কোটি	৪,৫৫৪ কোটি
২০১৩	৩৭.১৯ কোটি	৩,২৩৭ কোটি
২০১২	২২.৮৯ কোটি	১,৯০৮ কোটি
২০১১	১৫.২৩ কোটি	১,২৯৫ কোটি
২০১০	২৩.৬০ কোটি	১, ৯৬৮ কোটি
২০০৯	১৪.৯০ কোটি	১,২৪১ কোটি
২০০৮	১০.৭০ কোটি	৮৯২ কোটি

সুত্র: সুইস ন্যাশনাল ব্যাংক (এসএনবি) কর্তৃক প্রকাশিত 'ব্যাংকস ইন সুইজারল্যান্ড ২০১৪' শীর্ষক বার্ষিক প্রতিবেদন

[প্রথম আলো: ২০/০৬/২০১৫]

৬. বাংলাদেশে বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কর গোপন করার চিত্র

ক) চার সেলফোন অপারেটরের ৩,১০০ কোটি টাকা রাজস্ব ফাঁকি *[বণিকবার্তা, ০৮/০১/২০১৪]*

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রন কমিশন এর তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী, **দেশের শীর্ষ চার সেলফোন অপারেটর সিম রিপ্লেসমেন্টের নামে নতুন সিম বিক্রি করে প্রায় ৩,১০০ কোটি টাকা রাজস্ব ফাঁকি দিয়েছে**। প্রতিবেদনে বলা হয়, **গ্রামীণফোন** নতুন গ্রাহকের কাছে সিম বিক্রি করলেও তাকে রিপ্লেসমেন্ট দেখিয়ে ১,৫৬২ কোটি ২৯ লাখ টাকা রাজস্ব ফাঁকি দেয়। **বাংলালিংক** জুন ২০০৯ থেকে মার্চ ২০১১ পর্যন্ত ২৭ লাখ ৫৮ হাজার সিম রিপ্লেসমেন্ট এর মাধ্যমে ৭৬২ কোটি ৩৪ লাখ টাকা, **রবি** মার্চ ২০০৭ থেকে জুন ২০১১পর্যন্ত ৫২ লাখ ৬১ হাজার ৫৪১টি সিম রিপ্লেসমেন্টের নামে ৬৪৭ কোটি ২৪ লাখ টাকা এবং **এয়ারটেল** জানুয়ারী ২০১০ হতে জুন ২০১১ পর্যন্ত ৫লাখ ৫৮ হাজার ৭৮৩টি সিম রিপ্লেসমেন্ট করে ৩৯ কোটি ১২ লাখ টাকা রাজস্ব ফাঁকি দেয়।

খ) ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ কো:লি: এর ১,৯২৪ কোটি টাকা রাজস্ব ফাঁকি, *[বনিকবার্তা ০৯/০১/২০১৪]*

ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ কো: লি: **২০০৯ থেকে নভেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত তাদের সিগারেটের মূল্যস্তরে অসত্য ঘোষণা দিয়ে মোট ১,৯২৪ কোটি টাকা রাজস্ব ফাঁকি দেয়**। প্রতিষ্ঠানটি মধ্যম স্তরের ব্র্যান্ডের সিগারেটকে মিথ্যা ঘোষণার মাধ্যমে নিম্নস্তরের বলে চালিয়ে দেয়।

৭. কালো টাকা পাচার রোধে ভারত কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ:

ক) অপ্রদর্শিত অর্থনীতির উপর শ্বেতপত্র প্রকাশ:

২০১২ সালের মে মাসে ভারত সরকার অপ্রদর্শিত অর্থনীতির উপর শ্বেতপত্র প্রকাশ করে। ভারত আন্ত:দেশ ব্যবসা বৃদ্ধির জন্য ৮৮টি দেশের সাথে DTAAs (Double Taxation Avoidance Agreement) চুক্তি সম্পাদন করেছে এবং তথ্যের আদান প্রদানের ক্ষেত্রে ২২টি দেশের সাথে TIEAs (Tax Information Exchange Agreement) চুক্তি সম্পাদনের উদ্যোগ নিয়েছে ও এর আওতায় ইতিমধ্যে দেশটি ৮টি দেশের সাথে TIEAs চুক্তি সম্পাদন করেছে। এর ফলে ভারত বিগত ১০বছরে পাচারকৃত অর্থের মধ্যে প্রায় ১১৭ হাজার কোটি রুপি রাজস্ব আদায় করে।

বছর	রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ (রুপি)
২০০২-০৩	১,৩৫৬ কোটি
২০০৩-০৪	১,২৯০ কোটি
২০০৪-০৫	৪,৪১৮ কোটি
২০০৫-০৬	৮,০৪৯ কোটি
২০০৬-০৭	৯,১৪৭ কোটি
২০০৭-০৮	১১,৭৯০ কোটি
২০০৮-০৯	১৫,৭৪০ কোটি
২০০৯-১০	১৬,১৯৮ কোটি
২০১০-১১	২১,৫০৯ কোটি
২০১১-১২	২৭,৪৪২ কোটি

Source: White paper on Black money, India 2012

খ. বিদেশে পাচারকৃত কালো টাকা সংক্রান্ত আইনী পদক্ষেপ:

বিদেশে অর্থ পাচার প্রতিরোধে ভারত সরকার একটি বিশেষ আইন প্রণয়ন করতে যাচ্ছে এবং ইতিমধ্যে সংসদে নতুন একটি আইনের প্রস্তাব বিল আকারে উত্থাপন করা হয়েছে।

বিদেশে অর্থ পাচার প্রতিরোধে প্রস্তাবিত এই আইনটির বিশেষ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হলো:

- বৈদেশিক সম্পদের ক্ষেত্রে আয় এবং সম্পদের তথ্য গোপন ও কর ফাঁকি দিলে ১০ বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান
- এই ধরনের অপরাধ মীমাংসার অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিরা অভিযোগ মীমাংসার জন্য Settlement Commission এর কাছে যেতে পারবেন না।
- আয় বা সম্পদের তথ্য গোপন করলে আয় বা সম্পদের উপর ৩০০% কর আরোপ করা হবে।
- আয়কর রিটার্ন জমা না দিলে বা এতে বৈদেশিক সম্পদ সম্পর্কে ভুল তথ্য দিলে ৭ বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান থাকবে।

গ. অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে কালো টাকা প্রতিরোধে আইনী পদক্ষেপ:

দেশের ভিতরে কালো টাকার বিস্তার প্রতিরোধে বেনামী লেনদেন নিষিদ্ধ বিল নামের আরও একটি আইনের বিল লোকসভার বর্তমান অধিবেশনেই উত্থাপন করা হবে।

- সরকার ধারণা করছে যে, এই আইন বেনামী সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার মাধ্যমে, বিশেষ করে আবাসন খাতে বেনামী সম্পদের মাধ্যমে কালো টাকা অর্জনের একটি বড় পথ বন্ধ করা সম্ভব হবে। মূল মালিকের পরিবর্তে অন্য আরেকজনের নামে সম্পদ করা বা রাখাকেই বেনামী সম্পদ হিসেবে অভিহিত করা হচ্ছে। প্রস্তাবিত আইনে এসব সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার কথা বলা হয়েছে।
- ২০০০ ডলারের উপর যেকোনও কেনাকাটার ক্ষেত্রে Personal Identification Number (PIN) থাকা বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। আর এ ধরনের কেনাকাটার ক্ষেত্রে নগত লেনদেনও নিষিদ্ধ করা হচ্ছে।
- আইন বাস্তবায়ন জোরালো করতে, Centre Board of Taxes এবং Central Board of Excise and Custom কারিগরি দক্ষতা বাড়াবে এবং পরস্পরের তথ্যভাণ্ডার ব্যবহার করবে।

৮. পাচার করা অর্থ দেশে ফিরিয়ে আনা কি সম্ভব ?

দেশের প্রচলিত মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে অর্থায়ন বন্ধে বাংলাদেশসহ ১৪৭টি দেশ আন্তর্জাতিক সংস্থা "এগমন্ট গ্রুপ" এর সাথে জুলাই ২০১৩-এ চুক্তি সম্পাদন করায় এই পাচার করা অর্থের তথ্য পাওয়া সম্ভব। এক্ষেত্রে বাংলাদেশকেও সুইজারল্যান্ড-এর সাথে অর্থ পাচার সংক্রান্ত তথ্য আদান প্রদানের চুক্তি করতে হবে। আন্তর্জাতিক মানি লন্ডারিং প্রতিরোধে Financial Action Taskforce (FAT) এর আওতায় Asia-Pacific Group on Money Laundering এগমন্ট গ্রুপ-এর আওতায় বিভিন্ন দেশকে পাচারকৃত অর্থ ফিরিয়ে আনতে সহায়তা করে। বাংলাদেশ ব্যাংক ও দুদক নিরপেক্ষ ভাবে কাজ করলে এই পাচারকৃত অর্থ উদ্ধার করা সম্ভব হবে। তাছাড়া জাতিসংঘ দুর্নীতি বিরোধী আন্তর্জাতিক সনদে স্বাক্ষর করায় বাংলাদেশ সকল প্রকার দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত কালো টাকার উৎস বন্ধ এবং সুইস ব্যাংক সহ বিভিন্ন দেশ এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমাকৃত সকল অবৈধ অর্থ উদ্ধারে সরকার, বাংলাদেশ ব্যাংক, এনবিআর এবং দুদকের দায়বদ্ধতা রয়েছে।

৯. আমাদের দাবি:

- বাংলাদেশী নাগরিকদের বা কোন দ্বৈত নাগরিকত্ব সম্পন্ন বাংলাদেশীদের বিদেশে সম্পদ ও ব্যাংক একাউন্ট থাকলে তাকে ফি-বছর বিবরণী বাংলাদেশে দিতে হবে। তথ্য গোপন ও কর ফাঁকি দিলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে।
- মালয়েশিয়া সহ বিভিন্ন দেশে যেসব বাংলাদেশী নাগরিক নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছে, তাদের সকল অর্থনৈতিক তথ্য পরীক্ষা করে শ্বেতপত্র প্রকাশ করতে হবে।
- সুইজারল্যান্ডসহ বিভিন্ন দেশের সাথে ব্যাংক লেনদেনের স্বচ্ছতার উপর আন্ত-দেশীয় চুক্তি সম্পাদন করতে হবে।
- আইনগত শাস্তির বিধান রেখে হুন্ডির মাধ্যমে টাকা পাচার বন্ধ করতে হবে। কোন সরকারি বা বেসরকারি চাকরিজীবী হুন্ডির মাধ্যমে টাকা পাঠালে তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করতে হবে।
- বেনামী সম্পদ কেনা বন্ধ করার জন্য ভারতের পথ অনুসরণ করে আইন প্রণয়ন করতে হবে। যেমন,
  - ২০০০ ডলারের উপর যেকোনও কেনাকাটার PIN ব্যবহার এবং এ ক্ষেত্রে নগদ লেনদেনও নিষিদ্ধ করা
  - ধরা পড়লে বেনামী সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা

- হলমার্ক, বিসমিল্লা গ্রুপ, বিভিন্ন রাষ্ট্রায়াত্ত ও বেসরকারি ব্যাংক সহ শেয়ার বাজার কেলেংকারীর আত্মসাতকৃত টাকার উপর তদন্ত কমিশন ও শ্বেতপত্র প্রকাশ করতে হবে।
- সম্প্রতিক বাংলাদেশী ও রোহিঙ্গা অভিবাসী পাচারের সাথে মোবাইলে টাকা পাঠানোর বিষয়টি জড়িত এবং এই টাকা কিভাবে থাইল্যান্ড ও মালয়েশিয়া যায় তা খতিয়ে দেখতে হবে, পাশাপাশি আমরা এ ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি ব্যাখ্যা দাবি করছি।
- বহুজাতিক কোম্পানি গুলো বিভিন্ন পন্থায় প্রকৃত আয় গোপন করে বিদেশে অর্থ স্থানান্তর করে থাকে। বিশেষ করে ওভার/আন্ডার ইনভয়েসিং এর মাধ্যমে অর্থ পাচার করে থাকে। এই কোম্পানি গুলো দেশে কত টাকা বিনিয়োগ বা আয় করলো তা অডিট করে এর রিপোর্ট জনসম্মুখে প্রকাশ করতে হবে। পাশাপাশি এনবিআর-কে প্রদেয় তথ্যের সত্যতা যাচাই করতে হবে।
- সবার উপর দেশের সকল রাজনৈতিক শক্তিকে একটি ন্যুনতম সমঝোতা করতে হবে, যাতে দেশের পুজি ও কষ্ট অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা (যা মূলত আয় হয় বিদেশে বাংলাদেশী শ্রমিক এবং দেশে গরীব গার্মেন্টস শ্রমিক হতে) পাচারে কঠিন ব্যবস্থা নেয়া হয়। আর্থিক খাত তথা ব্যাংকিং সেক্টরে বিশেষ করে পাবলিক ব্যাংকিং সেক্টরে জনগনের প্রতি দায়বদ্ধতা তৈরি করতে হবে। সবার উপরে আমরা বিশ্বাস করি যে, সংঘাতপূর্ণ রাজনীতি (পরস্পরকে নি:শেষ করে দেবার রাজনীতি) পরিহার করে সবার ভেতরে বিশেষ করে ব্যবসায়ীদের ভেতরে পূর্ণ নিরাপত্তা, মর্যাদাপূর্ণ আচরন ও আইনের শাসনের প্রতি পূর্ণ আস্থা নিশ্চিত করতে হবে। এটা না হলে টাকা পাচার হতেই থাকবে এবং তার সাথে হতে থাকবে ব্রেন ডেন অর্থাৎ দেশের জ্ঞানী মেধাপূর্ন লোকজন শান্তি, মর্যাদা ও নিরাপত্তার আশায় দেশ ত্যাগ করবে।

সচিবালয় ঃ ইক্যুইটিবিডি, বাড়ি: ১৩ (মেট্রো মেলোডি), রোড়: ২, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭।
ফোন: ৮৮-০২-৮১২৫১৮১/ ৯১১৮৪৩৫, ই মেইল: info@equitybd.org, ওয়েব: www.equitybd.net